তপু মায়ের যুদ্ধ

বাণী দত্ত

২০০৫ সালের অক্টোবর মাসের বারো তারিখ। তপুরাণী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুমটা তাঁর এমনিতে ভালোই। তার ওপর সারাদিন ধরে গেছে বিজয় দশমীর ধকল। এসব নিয়ে বেশ ক্লান্তই ছিলেন। বিসর্জন হয় সারারাত ধরে। শোভাযাত্রা করে ঠাকুর চলে যান। ছেলেরা যায় নেচে কুঁদে। যখন ছিলেন তখন দেখেছেন বাবা কাকারা ঠাকুরের শোভাযাত্রায় পদযাত্রা করতেন। টুকটাক বাজি পটকা ফাটাতো। তারাতারি জ্বলত জিকমিক করে। নাচা কোঁদা ছিল না, সবসময় একটা বিদায়ী বেহাগের মুর্চ্ছনা থাকতো। এখন দিন বদলেছে। মায়ের বিদায়ের ক্ষণটি যেন এক উচ্ছ্বাসের পরিমণ্ডল।

আগে বাড়ির গিন্নিরা যেতেন শোভাযাত্রায়। এখন গিন্নিরা কম যান। অল্প বয়সী মেয়ে বৌরা যায়। সুযোগ পেলেই দু - এক বার ধেই ধেই করে নেচেও নেয়। তপুরাণী এখন আর ওসব পারেন না। কমবয়সে যদিওবা কিছু উন্মাদনা ছিল। সম্প্রতি দীক্ষা নেওয়ার পরে বাহ্যিক আড়ম্বরের থেকে নিজের পরিবেশেই ঈশ্বরকে ডাকতে ভালোবাসেন তিনি। জয়ন্ত আর সুমন্ত অবশ্য সন্ধ্যাতেই বেরিয়ে গেছে বিসর্জন দেখতে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝনঝন করে। ঢাকের বাদ্যি শেষ হয়ে গেছে। মন্ডপে মন্ডপে আলোগুলো এখনও জ্বলছে। আজ সারা রাত্রিই জ্বলার কথা। অক্টোবরের রাত্রি শেষ। আগরতলায় ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। চারপাশের গভীর স্তব্ধতার মাঝে ত্রিপুরার ঘনায়মান শৈত্যে টেলিফোনের ঝনঝনানি তপুরাণীর বুকে কাঁপন তুলল। তিনি ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। বাড়ির কর্তা ওদিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হার্টের ব্যথা হওয়ার পর থেকে ডাক্তার রাত্রের জন্য ওনাকে একটা করে অ্যালজোলাম খেতে বলেছেন। তাই টেলিফোনের বিকট শব্দ তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়নি। কে জানে সন্ধ্যাবেলায় সিদ্ধি টিদ্ধিও খেয়েছে কী না।

- হ্যালো, তপুরাণীর ভয়ার্ত গলা।

-মা, আমি জয়ন্ত।

-কী ব্যাপার রে? এত রাতে ফোন; সব ঠিক তো?

-হ্যাঁ, মানে আমি তো ঠিকই আছি।

বোঝাই যায় জয়ন্ত দ্বিধাগ্রস্ত।

-তবে ফোন করছিস যে।

-মা, সুমন্তর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ও এখন হাসপাতালে আছে।

-কী বলছিস?

-হ্যাঁ মা, ফ্রাকচার হয়েছে মনে হচ্ছে। আমাকে হাসপাতাল থেকে মোবাইলে জানায়। আমি গিয়ে দেখে এসেছি। ডাক্তাররা বলছেন গার্জেনের আসা দরকার?

-অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে কখন?

-মোটামুটি রাত আড়াইটে নাগাদ। গাড়ি টাড়ি জোগাড় করে ওকে রেসকিউ করে আনতেই সাড়ে চারটে বেজে যায়। আমি খবর পেয়ে ওকে দেখে তারপর তোমাকে ফোন করছি। তুমি একবার আসতে পারবে? বাবুকে ডেকো না। হার্টের ওপর চাপ বাড়বে। আমি মোটর সাইকেল নিয়ে যাচ্ছি।

-না, বাবুকে ডাকব না। তুই চলে আয়। আমি রেডি হচ্ছি।

সুমন্তর বাবারা দু-ভাই। দেওর এ বাড়ীতেই আলাদা থাকেন। তপুরাণী জা -এর ঘুম ভাঙিয়ে ব্যাপারটা বললেন। এবং জা-কে অনুরোধ করহেন সুমন্তর বাবার ঘুম ভাঙলে তাকে য়েন জানানো হয় যে সুমন্তর পা ভেঙেছে। গামছা, আন্ডারপ্যান্ট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন। হাসপাতাল আর রোগী তিনি অনেকবার করেছেন। তাই জানেন কী কী নিতে হবে। এই কাকভোরে আর ওসব জিনিস কোথায় পাওয়া যাবে? টাকাকড়ি কিছু হাতে নিলেন। সুমন্তর যদি পা ভেঙে থাকে, তাহহে ডাক্তার নিশ্চয়ই ভর্তি করবেন। তাই হাসপাতালে ছেলেকে দেখেই কেঁদে ফেললেন। দেখেই বুঝতে পারলেন ব্যাথায় বেশ কাতর। ডান - পাটা কীসব দিয়ে বাঁধা। অন্য হাত পা গুলোতেও ব্যথা। তখনও হাসপাতালের ট্রলিতে বসে। টেকনিশিয়ান এলে এক্স -রে হবে। মাথাতেও লেগেছে। তপুরাণী ছেলের পাশে দাঁড়ালেন। মাকে দেখে সুমন্তর চোখে জল।

-তুই কোথায় গিয়েছিলি?

-বিশালগড়

-কার সাথে?

-হৃষিকেশের সাথে। বাইকে গিয়েছিলাম।

-অ্যাক্সিডন্টে হল কেন?

-কি জানি।

-এখন কী কষ্ট হচ্ছে বল।

-সব জায়গা ব্যথা।

তপুরাণী জয়ন্তকে দাঁড় করিয়ে ছুটে এমার্জেন্সি রুমে গেলেন। ডাক্তারকে নিজের পরিচয় দিলেন।

-হ্যাঁ আপনার ছেলের রোডট্রাফিক আক্সিডেন্ট হয়েছে। আজকালকার ছেলে বুঝছেন তো। কথাবার্তা শোনে না। আজ সারারাত ধরেই তো অ্যাক্সিডেন্ট, মদ খেয়ে অজ্ঞান, মারামারি করে ইনজুরি - এসব কেসই আসছে।

-হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। কিন্তু আমার ছেলেটা যে ব্যথায় ছটফট করছে।

-আমরা হিস্ট্রি নিয়েছি। ব্যথার ওষুধ দিয়েছি। টেট ভ্যাক পেয়েছে। স্টাফেরা গিযে আপাততঃ একটু ড্রেসিং করে দিক। এর মধ্যে টেকনিশিয়ান এলেই ওর অনেকগুলো ফটো হবে। আপনারা টাকাটা জমা করে দেবেন। ফটোগুলো দেখেই আমি ওয়ার্ডে দেবো। তারপর দশটা এগারোটায় অর্থোপেডিক সার্জেনের সঙ্গে কথা বলবেন।

সে তো বলবেনই তপুরাণী। কিন্তু ঈশ্বর এ কী শাস্তি দিলেন তাঁকে? দুই সন্তানের মধ্যে সুমন্তই ছোট। কোলের ছেলের ছোটটির উপর আলাদা একটা আকর্ষণ থাকে, সুমন্তর প্রতি তার স্নেহটা সেরকমই। অথচ ওই যেন বেশি ভোগে। ডান চোখটা নষ্ট হল। সে যখন অনেক ছোট। ওকে নিয়ে ত্রিপুরা আর শঙ্কর নেত্রালয় করতে করতে লাখ সাতেক খরচ হল। তবুও বুক বেঁধে ছিলেন। ছেলে দুটো দাঁড়াতে পারলে বাবার সাহায্য হবে। ওদের বাবা প্রথমে কন্টাকটরি করতেন। জয়ন্ত হবার পর মুদির দোকান দেন। তাতেই মোটামুটি চলে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করে বড় খরচের ধাক্কা এলে কী ভাবে সামলাবেন?

হাঁটতে হাঁটতে আবার ছেলের কাছে এসে দেখেন দুই ভাই গল্প করছে। সুমন্ত হাত পা গুলো প্রায় নাড়তেই পারছে না। তারও মাথাটা ঘুরছে। তবু সেকথা ভুলে তপুরাণী ছেলের কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।.

> এরপর সুমন্তকে নিয়ে মা তপুরানি ও দাদা জয়ন্ত কলকাতায় চলে আসে। প্রথমে নামকরা বেসরকারি হাসপাতালে, তারপর সরকারি হাসপাতালে সুমন্তর নানা চিকিৎসা হয়। তাতে অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি হতে থাকে। অবশেষে ভাগ্যবলে শুভ যোগাযোগ হয়। রামরিক হাসপাতালের ডনৈক দক্ষ ও সহৃদয় ডাক্তার তাকে দেখেন ও নিজের হাসপাতালে নিয়ে এসে ঐ মৃতপ্রায় রোগীকে বাঁচিয়ে তোলেন। তারপর....

মনটাতে মিশ্র অনুভূতি তপুরানীর। সুমন্তকে নেয়নি পিজি। চারুবাক কাল ফোনে বলেছিল বটে ক্যাচ যখন নাই তবে ভর্তি হবার চান্সও নাই। তবুও এ হাসপাতাল থেকে যখন পাঠানো হয়েছে, তপুরাণী সুমন্তর অনড় দেহটাকে নিয়ে পিজির ডাক্তারদের সন্নিধানে গিয়েছিলেন। ডাক্তাররা দেখে শুনে বললেন লস্ট কেস। তবুও চেষ্টা করে দেখতে হবে। তপুরাণী জানালেন তিনি এ হাসপাতালেই ভর্তি করেছিলেন ছেলেকে। জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তারবাবুরা কোন আশা না দেখে রামরিক হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। ওখানে জ্ঞান ফিরেছিল।

-রামরিক? সেটা কি বস্তু? একজন।

-সেটা একটা সরকারি হাসপাতাল স্যার। উত্তরটা খলিল দিল।

-সেটা কোথায়? অন্যজন।

-সেটা ভবানীপুরেই স্যার। এখান থেকে হেঁটেই যাওয়া যায়।

-পিজি ওর জ্ঞান ফেরাতে পারেনি, রামরিক পেরেছে?

-ভর্তি বললেই কী ভর্তি হয়?

-তাহলে স্যার ওর ভাঙা হাড়গুলোর কী হবে?

-এখন ওরকমই থাকবে। মেডিক্যাল কলেজ বা এন আর এস হাসপাতালে যান। এখন দুমাস অর্থোপেডিক ও-টি বন্ধ। রিপেয়ার হচ্ছে। আপনারা বরং ওকে ত্রিপুরা নিয়ে যান। দুমাস বাদে খবর নেবেন, সরকারি কাজ, বুঝলেন তো? দেরিও হতে পারে।

শেষ চেষ্টার জন্য তপুরানী ছুটেছিলেন সুপারের অফিসে। সুপার নেই। তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করতে গেছেন।

অতএব রামরিকে পুনরপি। ফিজিশিয়ান বলেই দিযেছিলেন রিস্কবন্ডে নিয়ে যেতে। ভর্তি না হলে আবার ফিরে আসবে। সুমন্তর ফিরে আসার পরে ফিজিশিযান রাউন্ডে এলেন। খলিল গিয়ে সব বলে এসেছে।

-কী ভর্তি নেয় নি?

-না, স্যার ওটি মেরামত হচ্ছে।

-ওটি বাদ দিয়ে বাকি সবই তো আছে। ডাক্তার আছে, ওয়ার্ড আছে। ওকে না হয় সার্জরি ওটিতে নিয়ে গিযেও তো অপারেশন করতে পারত। আসল ব্যাপারটা হোল করবে না। টেম্পারামেন্টের অভাব। কিন্তু ঘটনাটা হলো যত দেরি হবে, ততই ব্যাপারটা কঠিন হয়ে পড়বে। ফলস্ জয়েন্ট তৈরি হয়েছে। ওগুলো ভাঙতে হবে। রড ঢুকিয়ে জোড়ালাগাতে হবে।

-তাহলে কী হবে স্যার?

-ওকে মেডিক্যাল কিবা এন-আর - এসে নিয়ে যেতে চান?

-না স্যার। আপনার পরামর্শ ছাড়া কিছুই করব না।

-ডাক্তার বাবু, দিলীপ সক্রিয় - প্রাইভেটে করতে কেমন খরচ হবে?

-জানি না। জিজ্ঞাসা করে বলতে হবে। আচ্ছা দাঁড়ান।

পিজির একজন প্রাক্তন অর্থোপেডিক সার্জন এখানে সুপারের অনুরোধে মাঝে মাঝেই দু-চারটে অপারেশন করে গেছেন। তাঁর ফোন নম্বরটা ছিল ফিজিশিয়ানের কাছে। তাঁকে ফোনে পাওয়া গেল। কথা হোল। সুমন্তর লাক ভালো। ইনি একজন অর্থোপেডিক সার্জন। খুবই ভালো সার্জেন। কাছেই একটা নার্সিং হোমে অপারেশন করে বেরিয়েছেন। বললেন এখনি দেখে যাচ্ছেন।

এবং এলেন। সুমন্তকে দেখলেন। এক্সরে গুলো দেখলেন। সুমন্তদের দুর্গতিও শুনলেন।

-দুটো স্টেপে অপারেশন করতে হবে। দু-আড়াই মাসের ধাক্কা।

সবথেকে কম দামি নার্সিং হোমে করলেও খরচ আছেই। অপারেশনের খরচটা যতটা সম্ভব কম করে নেব।

-তাহলেও স্যার কতটা খরচ হবে? মানে আমাদেরকে রেডি হতে হবে তো, দিলীপ বললেন।

-আমাকে তিনদিন সময় দিন। নার্সিং হোম, ওষুধপত্র, ইনস্টুমেন্টস্, ওটি চার্জ, অ্যানেসথেটিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সার্জন, মোটামুটি এগুলো হচ্ছে এমন খরচ। তারপর খুচখাচ তো আছেই। আমি আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে বসে মোটামুটি হিসাব করছি। আচ্ছা চলি তাহলে। আপনারা ভালো থাকুন। নমস্কার।

মনখারাপের এই ঘটনাগুলি ছেড়ে দিলে মন ভালোর উপাদানও পেয়েছেন তপুরাণী। সাতসকালে চারুবাক এব ইন্দ্রানী এসে হাজির মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে। ওদের বিয়ে অর্থাৎ সোশ্যাল ম্যারেজ হবে মাস তিনেক বাদেই। দিলীপ লাফিয়ে উঠলেন।

-তাহলে মিষ্টিতো আমরা খাওয়াব। একটু বস।

-না, না, এই তো মিষ্টি আছে। আর আপনাকে যেতে হবে না, ইন্দ্রানীর কথা।

-তা বললে হয়? সব সময়েই তো দুঃখের আবহাওয়ায় আছি। এরকম একটা সুখের খবরে একটু মিষ্টিও যদি না আনলাম তাহলে কীসের মাসিমা মেসোমশাই?

-ঠিক কথা, আমি আছি মেসোমশাই। আনুন, তবে অল্প করে। মিষ্টি জিনিস বেশি খেলে অফিসে ঘুম পাবে।

দিলীপ হেসে চলে গেলেন।

তপুরাণী পরম স্নেহে ইন্দ্রানীর পিঠে হাত রাখলেন।

-এবারে কিন্তু তা নয়। নিজের বর আর শ্বশুরবাড়ির সবাইকে নিয়ে থাকতে হবে।

-ইন্দ্রানী হাসলো,

-আমি তো অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

-তোমার ঠাকুমা তো খুব ঠাকুর ভক্ত মানুষ। তিনি তো চাইবেন তুমিও ওনার সঙ্গে থাকো। সেটা ম্যানেজ করতেই হবে, কারন তুমি তো ম্যানেজমেন্ট পড়া মেয়ে।

-মাসিমা, ম্যানেজমেন্ট পড়া একটা ব্যাপার তো বটেই। তাছাড়াও শ্বশুর বাড়িতে নতুন বউ এর আচরণের ব্যাপারে আমার নিজস্ব কিছু থিওরি আছে। আগেকার দিন খুব ছোট বয়েসে মেয়েদের যখন বিয়ে হোত তখন তাদের কোনও ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতো না।

তাই তারা জানত শ্বশুর ঘর করতে হবে। স্বামীর - সঙ্গে শ্বশুর - শাশুড়ি- দেওর-ননদ আত্মীয় স্বজন

সবাইকে নিয়ে চলতে হবে এই উপদেশ দেওয়া হত। বেশির ভাগ মেয়েই সেটাকে বেদবাক্য মনে করে শ্বশুরবাড়ি যেত। এখন ব্যাপারটা অন্য রকম। একটু বেশি বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়। বাপের বাড়ি থেকে মুখে ভালো ভালো কথা বলেও মনে মনে তাঁরা চান মেয়ে শ্বশুর ঘর না করে স্বামীর ঘর করুক। তাই তৈরি হচ্ছে ছোট ছোট পরিবার। যেখানে বাবা মা ছেলে মেয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। সামাজিক বন্ধন আলগা হচ্ছে।

-বাঃ খুব সুন্দর বললে তো।

-হ্যাঁ মাসিমা। আমার আইডিয়া খুব ক্লিয়ার। আমি মোটেই ভেবে নিই নি য়ে শ্বশুর বাড়িটা আমার কাছে ভয়ের ব্যাপার। আমি মোটেও ভেবে নিই নি ও বাড়ির সন্তানকে আমি ছিনিয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় ঘর বাঁধব। শ্বশুর শাশুড়ি তো ভালো মন্দ মিশিয়ে আপনার আমার মতই মানুষ। তাঁদেরকে আমি প্রতিপক্ষ ভাবব কেন?

তপুরাণী পরম আবেগে ইন্দাণীকে জড়িয়ে ধরলেন,

-তুমিই পারবে। তুমি পারবেই। দেখো তুমি খুব সুখি হবে।

-মাসিমা এটা কেমন হোল? চিনলেন আগে আমাকে। আর যত আদর ইন্দ্রানীকে।

-ওতো আমার মেয়ে। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি য়ায। তাই মায়েদের কাছে বেশি আদর পায়।

ইন্দ্রানী হাইনেক ব্লাইজের কলার তুলে চারুবাকের দিকে তাকিয়ে একটু কায়দা করল। তিনজনেই সমস্বরে হেসে উঠল।

দিলীপ এলেন। হাতে সন্দেশ, রসগোল্লা আর নিমকি।

-কী ব্যাপার হচ্ছিল?

-আর বলবেন না মেসোমশাই। সব আদরটা ইন্দ্রানীই খেয়ে নিল। আমি আপনার জন্যই ওয়েট করছিলাম। মনের দুঃখে মিষ্টি গুলোই আমি খাই।

-কী লোভী রে বাবা।

তিনদিন বাদে সকাল ছ'টায় ফোন করলেন দিলীপ। তিনি ছক কেটে ফেলেছেন। দু'দফায় অপারেশন হবে। প্রথমটা হবে কামালগাজির একটা নার্সিং হোমে। বড় ফ্র্যাকচার গুলো তখন হবে। ওদের ওখানে সেট আপ ভালো। অর্থোপেডিক অপারেশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয়টা হবে মৌলালির একটা নার্সিং হোমে। সেটা স্টিফ জয়েন্ট এবং ছোটখাটো অন্যান্য সমস্যার গুলোর জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা হবে। মনে হয় আড়াই মাস লাগবে, সম্ভাব্য খরচ আড়াই লাখ। কম বেশি হতেই পারে।

ফিজিশিয়ান টেলিফোনে শুনলেন। জানালেন যে খরচ সম্বন্ধে তার ধারনা নাই। সরকারি হাসপাতালে কাজ করলে এই ধারনা গুলো অনেকেরই থাকে না। তবে তিনি যখন বলে দিয়েছেন, আশা করা যায় খরচটা সঙ্গত খরচই হবে।

সিদ্ধান্ত হল যে দিলীপ আজই চলে যাবেন। টাকা কড়ির ব্যবস্থা করে চলে আসবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশনটা করা দরকার। তারপরই বোধোদয় হোল। আরে আজ তো বারো ঘন্টা বন্‌ধ্। গাড়ি ঘোড়া তো চলবে না। সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা বন্‌ধ্ উৎসব। সন্ধ্যা বেলায় বন্‌ধ্ সমর্থন করার জন্য জনগনকে অভিনন্দন, বন্‌ধ্ সর্বাত্মক হয়েছে বলে হর্ষ এবং বন্‌ধ্ পণ্ড হয়েছে বলে অন্যদের কটাক্ষ, ইত্যাদি ইত্যাদি চলতে থাকবে।

ভাগ্যিস হাসপাতালটা হাঁটাপথ।

হাসপাতালে এসে ছেলেকে বললেন তাঁদের প্ল্যান।

-বাবু, তুমি চলে গেলে আমার মন খারাপ করবে।

-মন খারাপ করবে কেন? মা আছে, স্যার আছেন, খলিল আছে।

-তুমি দাদাভাইকে পাঠিয়ে দাও।

-আমি ক'দিন বাদে ফিরে আসবো। ব্যবস্থা গুলো করে।

তোর অপারেশনের সময় দাদাভাই আসবে। অপারেশন হয়ে গেলে আমি চলে যাব। দোকানটা তো দেখতে হবে। মন খারাপ করবি না। তাহলে আমারও মন খারাপ হবে।

প্যারালিসিসের যে রোগিটির অ্যাকুপাংচার করছিলেন ফিজিশিয়ান, তার আজ বাড়ি ফেরার কথা। ছেলেটির নাম শিবু। বাড়ি বর্ধমান জেলায়। চারটে হাত পা হঠাৎ পড়ে যায়। শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। পিজিতে গেছিল। বলেছিল ভর্তি হতে হবে। একটা ওষুধ লাগবে। খরচ প্রায় দেড় লাখ টাকা। তার উপর বেডও নাই এই মুহূর্তে। ঘুরে ফিরে ভর্তি হোল এখানে। ফিজিশিয়ান বলেছিলেন রোগের না জি বি সিনড্রোম। এতে হঠাৎ করে বা কিছু সময় ধরে চারটে হাত পা পড়ে যায়। কিছু সারে, কিছু সারে না। কয়েক জায়গায় ঘা খেয়ে খেয়ে শিবু এখানে

ভর্তি। ডাক্তার বললেন এখ ধরনের ইনজেকশন আছে যেটা অনেক দামি। কিন্তু সেটা দেওয়ার সময়টাও পেরিয়ে গেছে। এখন একটি উপায় এবং তা হোল অ্যাকুপাংচার করা। শিবু রাজি হয়। ফিজিশিয়ান তিন মাস ধরে অ্যাকুপাংচার করে তার চলার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এটা না হলে শিবুকে সারাজীবন ধরে চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় থাকতে হতো।

শিবু সুমন্তর কাছে এল।

-সব থেকে মন খারাপ হবে তোকে না দেখতে পেয়ে।

-শিবুদা এখন বাড়ি গিয়ে কী করবে?

-আমার একটা ছোট ব্যবসা আছে। ওটা আবার আরম্ভ করব।

-শিবুদা, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

-হবেই তো। আরে, আমাকে তো আউটডোরে দেখাতে আসতে হবে। তখন আমি তোর সঙ্গে দেখা করে যাব। মাসিমা মেসোমসাইদের সঙ্গে দেখা হবে তখন।

হাসপাতালে সবই রোগি হয়ে আসে। কেউ ভালো হয় কেউ নয়। যারা বেশি দিন থাকে তাদের মধ্যে একটা সখ্য গড়ে ওঠে। সেখানে বত্রিশ বছরের শিবুর সঙ্গে একুশ বছরের সুমন্তর বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগে না।

সুমন্ত ছল ছল চোখে দেখে দিলীপের সান্ত্বনা,

তুই ও তাড়াতাড়ি ভালো হ'। তারপর তোকে নিয়ে তোর শিবুদার বাড়ি যাব।

-দারুন ভালো হবে। খবর দিলে আমি এসে নিয়ে যাব।

একটু বাদেই ফিজিশিয়ান এলেন। ছুটির দিন, বন্‌ধের দিন, -সব দিনই উনি আসেন। বন্‌ধের দিনগুলোতে অ্যাম্বুলেন্সে আসেন। মাস তিনেক আগে যে শিবু হাত পা নাড়তে পারত না, নিজের খাবারটা খেতে পারত না, সে আজ জল ভরা চোখে রীতি মত নত হয়ে তার চিকিৎসককে প্রণাম করলো।

ফিজিশিয়ান তাকে তুলে বললেন,

-আমাকে নয় তুমি তোমার ঠাকুরকে প্রণাম করবে। আর যত রকম ভাবে ব্যায়াম করা যায়, সব করবে।

-আচ্ছা স্যার।

এমন সময়ে চারুবাক এসে হাজির। অলিগলি ভিতরের রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে হাসপাতাল পর্যন্ত।

-আজ আসতে পারলে?

-বড় রাস্তাটা অ্যাভয়েড করেছি। তাও এক জায়গায় আটকে ছিল। তাদেরকে বললাম রামরিক যাচ্ছি। আমার রোগির জন্য ওষুধ আনতে হবে। দরকার হলে তোমরা কেউ চল। দেখ। এসব শুনে এরা ছেড়ে দিল।

ফিজিশিয়ান হাসলেন,

-সেটা একটা বিরল সৌভাগ্য। বন্‌ধ্ করছে অথচ বীরত্ব দেখাবার সুযোগ নষ্ট করবে। এমন হয় না কি?

- লোকে নয় সুমন্ত। সাধারন লোক এসব ঝুটঝামেলা থেকে দূরে থাকতেই চায়। বন্‌ধ্ ডাকে পার্টি। অর্থাৎ কিছু লোকের সমষ্টি, যাদের মুখের কথা আর সত্যিকারের অ্যাক্‌শনের মাঝে বিরাট ফারাক। বলে এক, করে আর এক, হয় আর এক। এই বন্‌ধ্, স্ট্রাইক, হরতাল, অবরোধ, চাক্কা জ্যাম, এসবই হোল পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর বাঁদরামি।

-চারুদা, শিবুদা আজ চলে যাচ্ছে। অ্যাকুপাংচার করে ওর প্যারালিসিসটা ভালো হয়ে গেছে।

-খুব ভালো খবর। ডক্টর, সব রকম প্যারালিসিসই এতে সারে?

-না। সব প্যারালিসিস ভালো হয় না। শিবুরটা যে টাইপের, সেটা প্রথম থেকে চিকিৎসা হলে পুরো ভালো হবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু স্ট্রোকে বা আঘাত জনিত যে প্যারালিসিস বা টিউমার থেকে যে প্যারালিসিস, তার রেজাল্ট ততটা হয় না। কিছুটা হয় অবশ্যই।

-আচ্ছা ডক্টর বাত বা হাঁপানি রোগেও না কী অ্যাকুপাংচার ভালো কাজ করে। আপনি সে রকম রোগ সারান না?

-না, আউটডোরে যে গুলো করা যায়, সেগুলো করি না। ওর জন্য অন্য হাসপাতাল আছে। আমি করি সেই কেসগুলোই যে গুলো ইনডোর ছাড়া করা যায় না। যেমন পায়ের গ্যাংগ্রিন, কহরনিক, কিডনির রোগ, কিছু কিছু প্যারালিসিস, ইসকিমিক হাট ডিজিজ, প্যানক্রিয়েটাইটিস, এই সব।

-ডাক্তার বাবু শেষ দুটো নামে তো চমকে উঠলাম। আমার জে কাকা প্যানক্রিয়েটাইটস রোগে মারা গেলেন, সেটাতে আপনি অ্যাকুপাংচার করেন। আমার বাবা ইসকিমিক হার্ট, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে স্টেনট্ বসিয়েছেন।

কিছুদিন হোল ব্রেনে হিমরেজ হয়ে একটা সাইড গেছে। আপনি ইস্কিমির হার্টেও অ্যাকুপাংচার করলে স্টেন্ট আর ক্যাথিটার কোম্পানি গুলো আপনাকে ইলোপ করে দিতে পারে।

ফিজিশিয়ান হেসে ফেললেন।

-তা তো পারেই। পারলেও সত্যটা সত্যই। অ্যালোপ্যাথিক সায়েন্স সব জায়গাতে কী জয়ী হয়েছে। হিউম্যান হিলিং নিয়ে সঠিক ভাবনা হোল ইন্টিগ্রেটেড থেরাপি। যে শাস্ত্রে যেটা ভালো সেটাকে কাজে লাগানো দরকার। কিন্তু তা তো করা হয় না এদেশে। তাই কোন শাস্ত্রই ফুল প্রুফ নয়। ফাঁক ফোকর আছেই। যাই হোক সুমন্তর ব্যাপারটা আমাদের আর দেরি করার উপায় নাই। আপনারা রেডি হন। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে ওকে আমরা ছেড়ে দেব। অপারেশনের ব্যাপারটা চুকে গেলে তারপর আবার এখানে ভর্তি হবে। হাত পায়ের মাংসগুলো সব শুকিয়ে গেছে। ইচ্ছা আছে অ্যাকুপাংচার করে ওগুলো যদি একটু বাগে আনা যায়। আজ চলি তাহলে।

পরবর্তী আড়াই মাস তপুরানী আর দিলীপ পিংপং বলের মতো ছোটাছুটি করতে লাগলেন। প্রথম অপারেশন হলো কামালগাজির লাইফলাইন নার্সিং হোমে। ওখান থেকে আনা হোল মৌলালির কাছে সেবা নিকেতনে। ওখানে ড্রেসিং করা হত। মাঝে খুব জ্বর হল। স্বামী স্ত্রী দিশেহারা হয়ে গেলেন। ভাগ্যিস খলিল বহু সময়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। ফিজিশিয়ান খলিলকে প্রায়ই ছেড়ে দিতেন তপুরানী দিলীপকে সাহায্য করার জন্য। সহায়হীন এই পরিবারের জন্য খলিল সর্বতোভাবে তাদের সাহায্য করত। খলিল ফিজিশিয়ানকে ব্যাপারটা বলাতে তিনি সার্জনকে ফোন করে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন। যাই হোক ক্রাইসিস কেটে গেল। দ্বিতীয় বার অপারেশন হোল শিয়ালদার আর একটি নার্সিং হোমে। সেখানে দিন কয়েক থাকার পর সুমন্ত আবার এলো রামরিক হাসপাতালে।

ফিজিশিয়ান রাউন্ড দেওয়ার পরই দিলীপ এসে নমস্কার করে দাঁড়ালেন।

-বলুন, খবর বলুন।

-স্যার, আর যেন কোথাও পাঠাবেন না।

-সে কী? এমনিতে দরকার না হলে তো কোথাও পাঠাব না।

তবে ভালো ডাক্তারের কাছেই তো পাঠিয়ে ছিলাম।

তপুরানী পাশেই ছিলেন। ম্লান হাসলেন।

-স্যার, উনি ভালো ডাক্তার রোগের জন্য। রোগীর জন্য ভালো ডাক্তার আপনি।

ফিজিশিয়ান হাসলেন,

-না, না উনিও মানুষ ভালো। পরে দেখবেন।

-স্যার তাহলে আমাদের এখন কর্তব্য কী?

-সুমন্ত একটু চাঙ্গা হোক, তারপর আমি আকুপাংচার করব। তার আগে দেখি অপারেশনটা কেমন সহ্য করতে পারে। ওর মাংস গুলো অ্যাকুপাংচার করে একটু তৈরি করতে পারলে তারপর ওর হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করব। ঠিক আছে। আমি এখন আসি।

চারুবাক ক'দিন আসতে পারছে না। সপ্তাহ তিনেক বাদেই তাদের বিয়ে। জয়ন্ত অপারেশনের একদিন আগেই দুই বন্ধু সমেত এসেছিল। অপারেশনের দু'দিন বাদে ওরা ফিরেছে। চারুবাকের বিয়ের সময়ি আবার আসবে আবার দু-চারদিনের জন্য। দিলীপ তপুরানী একবার পিজি গেলেন ডাঃ ত্রিপাঠিকে খবরটা দেওয়ার জন্য। সেখানে গিয়ে শুনলেন সুপার ট্র্যান্সপার হয়ে গেছেন এন আর এস হাসপাতালে। ফার্মাকোলজির হেড হয়ে। তপুরানী চারুবাকের দূরদর্শিতায় অবাক হলেন।

-দেখেছ, এই কথাটা চারুবাক অনেক আগেই বলে গেছে।

-তাই তো দেখছি। সত্যিই বোধ হয় খুব ভালো মানুষ এ পোস্টে থাকতে পারেন না। ঠিক আছে। সময় পেলে একদিন ওনার হাসপাতালেই গিয়ে ওনাকে খবরটা দিয়ে আসব। ওনার জন্যই তো রামরিকের সন্ধান পেয়েছিলাম।

মোবাইলটা বাজলো।। চারুবাক।

-মাসিমা, সুমন্তর খবর কী?

-এমনিতেই তো ভালোই। তবে খুব শুকিয়ে গেছে। খুবই দুর্বল। গায়ে অল্প জ্বর আছে।

-দু'দুবার অপারেশন হোল। ধকল তো হবেই।

-তুমি কী আজ বিকেলে আসবে?

-আমার সাড়ে তিনটের সময় কাজ শেষ হবে। তারপর যাব।

-যদি পারো, একবার এসো। তোমাকে দেখলে সুমন্তর ভালো লাগবে।

-আচ্ছা আমি আসব।

তপুরানী খলিলের আনা মাংসের ঝোল খাইয়ে হাসপাতাল থেকেই বাইরে এলেন। রাস্তাতে গাড়ির বিরাট জ্যাম। দিলীপ ভাবিত হলেন। আকাশটায় অবশ্য হাল্কা মেঘ। তাই রোদটা অত লাগছিল না।

গাড়ি তো কোনদিকেই নড়ছে না। চলো আমার রাস্তাটা পেরিয়ে ওদিকের ফুটপাত দিয়ে হাঁটা। কতটুকু আর রাস্তা?

-হ্যাঁ। কতটুকু আর। কলকাতা এসে অভ্যাসটাই বদলে গেছে। চলো হাঁটি।

সেই দুপুর বেলা মাথার উপর মেঘে ঢাকা সূর্য নিয়ে তপুরানী হাঁটতে লাগলেন। তাঁর মনে পড়ল বিয়ের পরে দিলীপের সঙ্গে পায়ে পায়ে কতই না হেঁটেছেন। দু'জনে মিলে হেসেছেন, খেয়েছেন, স্বপ্ন দেখেছেন। দিলীপ খুব একটা বড়ো স্বপ্নের ভাষা অবশ্য কোনদিন বলেন নি। তিনিও চাননি বিশাল বৈভব। ভালোই চলছিল চলে তো যেতই। কিন্তু সুমন্তর অসুখ বিসুখের চোটেই সব সঞ্চয় শেষ হয়ে এখন ঋণের দায়ে বন্ধ হয়ে গেলেন। দিলীপ অবশ্য চিরকালই অকুতোভয়। তাঁর থিওরি খুব সোজা সাপটা। টাকা বস্তুটা আসা আর যাওয়ার জন্যই। এসেছিল, এখন চলে যাচ্ছে। আবার আসবে। কবে আসবে সে ব্যাপারে তাঁর কোন চিন্তা নাই। কিন্তু তপুরানীর আছে। স্বামী সন্তানের মুখে দু-মুঠো ভাত তুলে দেওয়ার দায়িত্ব তো তাঁরই।

মঠে খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিলেন। চারুবাক আসতে পারে। সাড়ে তিনটের মধ্যে বেরিয়ে গেলেন। তখনও রাস্তা জ্যাম। স্কুটার বাজিয়ে সবার বুক কাঁপিয়ে একটা কনভয় গেল। এমনিতেই গাড়ির ভিড়। তার উপর ভি আই পি যাওয়ার তোড়ে চলতি গাড়ি ঘোড়া সব তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দিলীপ আর তপুরাণীও এই গতিস্থান রাস্তার স্রেফ একটি লোকের অবাধ বিচরণ দেখলেন।

গাড়ি চড়ার ঝামেলায় না গিয়ে দুজনেই আবার হন্টনে।

পৌনে চারটে নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছে দেখলেন চারুবাক তখনও আসে নি।

সুমন্ত ঘুমচ্ছিল। তপুরানী ছেলের মাথার দিকে বসলেন। দিলীপ নীচে নেমে গেলেন।

-দাদা, কেমন আছেন?

প্রশ্ন কর্তা নস্কর বাবু। সকলের বড়দা। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালক। আর একজন চালক আছেন। তিনি মুখার্জি বাবু। সকলের ছোটদা।

-ভাল আছি। আপনি?

-আমাদের আর থাকা না থাকা। কলকাতা, বুঝলেন না? এখানে মানুষ কী সুখে থাকে কে জানে? এই তো আজ বিকালে আমার বাড়ি যাওয়ার কথা। মুখার্জী বাবুর আসার কথা। তো আসতেই পারবেন না। গাড়ি পাচ্ছে না। বাইরে দেখছেন না? সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আজ একটা মিছিল আছে। চলুন, আমাদের ঘরে চলুন। চা হচ্ছে ওখানে মাস্টার মশাই আছেন।

দিলীপ সম্মতি জানিয়ে দোতলায় ওনাদের ঘরে গেলেন। মাস্টার মশাই অর্থাৎ ওয়ার্ড মাস্টার শংকর বাবু চা চাপিয়েছেন। চানাচুর দিয়ে আমের তেল দিয়ে মুড়ি মাখা হয়েছে। ফুটপাতের দোকান থেকে এসেছে বেগুনি।

-আরে, আসুন, আসুন। শংকরবাবুর আহ্বান। - ভালো আছেন?

-হ্যাঁ। ভালোই আছি আপনাদের দয়ায়।

-আমাদের দয়ায় কেন? ঈশ্বরের দয়াতেই ডাক্তার বাবুর হাতে পড়ে ছিলেন।

হঠাৎ দিলীপের নজর পড়ল ঘরের সিলিংটার দিকে। সিউরে উঠলেন। আরে ওটা কী। ছাদ যে একেবারে ঝুলে পড়েছে।

-হ্যাঁ, তাই তো। দেখছেন না আমরা তাই খাটের উপর খাট দিয়ে রেখেছি। ঠিক ওই ঝুলে পড়া চাঁদোযার তলায়। ওটা ভাঙবেই। তাই ভাঙা অংশটা পড়বে উপরের খাটে। আমরা একজন থাকলে তলার খাটটায় শুই। দু'জন থাকলে নিচের খাটের তলায় মেঝেতে শুই। যাই বলুন, এটা মেগা সিটি তো বটে।

-নিন, একবাটি মুড়ি খান। আর এই নিন চা।

দিলীপ মুড়ি চা খেতে আরম্ভ করলেন। বারবার তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল সিলিংটার দিকে। কলকাতার মানুষ সরকারি হাসপাতালের স্টাফেরা এত হীন দশায় থাকে। এ তো পশুর বসবাসের অযোগ্য। অথচ এই মানুষগুলো বিনা প্রতিবাদে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন। সাবাশ।

আধ ঘন্টা বাদে দিলীপ নামলেন। চারুবাক তখন বাইক থেকে নেমেছে। রুমাল বার করে ঘাম মুছতে মুছতেই বলল্ - মিছিল। এবং বিরাট মিছিল। গোটা কলকাতা প্যারালাইজড্। গলি খুঁজে বহু কষ্টে এসেছি।

মানুষের গতি কী ভাবে আটকাতে হয় সেটা আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর পায়ের তলায় বসে শেখা উচিত। চলুন, ওকে দেখে আসি।

একটা সুন্দর চকোলেট কিনেছে চারুবাক। ওটা হাতে নিয়ে সুমন্ত খুব খুশি।

-আমি আজ কিছুটা, কাল কিছুটা, পরশু কিছুটা খাব।

-তাই খেয়ো।

-চারুদার বিয়ে লাগছে, জানিস তো।

-না তো। কবে?

-শিগগির। জযন্ত আসবে দু'তিন দিনের জন্য। বিয়ে বাদে আবার চলে যাবে।

-খুব ভালো হবে। আমি দাদাভাইয়ের কাছে বিয়ের গল্প শুনবো। এ কথার মধ্যে যেন বেদনা আছে সেটা চারুবাকের কাছে মুহূর্তে ধরা পড়লো। এগিয়ে গিয়ে সুমন্তর মাথায় হাত রাখলো।

-আমার যে উপায় নাই সুমন্ত। থাকলে তোমাকেও নিয়ে যেতাম। কিন্তু তোমার গা টা যে গরম লাগছে। মাসিমা, একবার সিস্টারকে বলুন তো স্টেম্পারেচারটা দেখতে।

তপুরানী বলা মাত্র থার্মোমিটার নিয়ে হাজির হলেন সিস্টার পুতুল। সুমন্তর কাছাকাছি বয়সের ছেলে আছে তাঁর। তাই সুমন্তকে খুব স্নেহ করেন।

-এটা আবার কী বাধালি সুমন্ত? জ্বরটা তো বেশ আছে।

দেখি, একটা জ্বরের ওষুধ দিই, তারপর সন্ধ্যাবেলায় রাউন্ডে এসে হাউসস্টাফরা দেখবেন

-কই, কেমন আছে বাবা?

সবাইকে অবাক করে প্রভু এসে হাজির। ক'দিন ছিলেন না।

জেলায় গিয়েছিলেন একটা মঠের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। ঘন্টা দুয়েক আগে ফিরেছেন। তপুরানী আর দিলীপকে দেখতে না পেয়ে হাসপাতালে চলে এসেছেন।

-সুমন্ত এই দেখ, ইনিই প্রভু। মঠে ইনিই প্রধান। মঠেই থাকেন। এনার জন্য আমরা মঠে থাকতে পারছি। ওনাকে নমস্কার কর।

সুমন্তর বাঁ হাত ওঠেই না, কনুইটা শক্ত হয়ে গেছে। ডান হাতটা আংশিক। দুহাতে নমস্কারের ভগ্ন প্রয়াস করে বললো — নমস্কার প্রভু।

- নমস্কার বাবা। তুমি মায়ের কথা শুনো না। মঠের মালিক মহাপ্রভু। তাঁর দয়াতেই আমরা ওখানে আছি। আবার তাঁর দয়াতেই তুমি সেরে উঠেছ। আমি তোমার সব খবর রাখি। হাজার কাজে ব্যস্ত থাকি বলে আসতে পারি না। আজ একটু সময় পেয়ে চলে এসেছি।

চারুবাকের দিকে নজর পড়াতে চারুবাক হেসে নমস্কার করল।

-ভালো তো বাবা? মা কবে ঘরে আসছেন?

সিস্টার পুতুল জ্বরের জন্য একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট দিলেন। সেটা খেয়েই সুমন্ত বলে উঠল,

-বৌদি শিগগির আসছে। দেরি করলে আমরা টেনে আনব। সবাই হেসে উঠলেন।

-তোমার জন্য মহাপ্রভুর চরণামৃত এনেছি। এটা খাও তো বাবা।

-প্রভু আমি কবে সেরে উঠব?

-যার এরকম মা বাবা আছেন, সে সেরে উঠবেই। পূর্বজন্মের কোন কর্ম দোষে এ জন্মে তোমার এই শাস্তি। তবু ঈশ্বরের দয়ায় দেহ বলতে যা আছে সেটার যত্ন করবে। শরীরং আদ্যং খলু ধর্ম সাধনং।

-পূর্বজন্মের দোষের জন্য, এ জন্মে শাস্তি হয়? চারুবাক জিজ্ঞাসু।

-হয় বই কী বাবা। জন্মজন্মান্তরের এ এক কঠিন লিংক। কর্মফল ভোগ করতেই হবে। তবে উপায় তো ঈশ্বরই বলে দিয়েছেন। তাঁর শরণ নাও। ধর্মযুদ্ধে যখন অর্জুন নিজের আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করতে দ্বিধা করছিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে পথ বলে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যার আলো অস্তমিত হতে হতে স্বপ্নঘন হয়ে উঠছে। কলকাতার আকাশে পাখি কম। তবু আশে পাশে টুকটাক গাছ গাছালিতে পাখিগুলো সারাদিনের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প করছে। প্রকৃতি বিধুর। সেই সর্ববিধুরতার মাঝে গৈরিক বস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসী সেজে বুঝি অন্তর্যামীই বলে উঠলেন - সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ।।

সব ধর্ম ত্যাগ করে আমরা শরণ নাও। শোক করো না। আমি তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত করব।